গল্প

কংক্রিট

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

কংক্রিট

সিমেন্ট ঘাঁটতে এমন ভালো লাগে রঘুর। দশটা আঙুল সে ঢুকিয়ে দেয় সিমেন্টের স্তূপে, দু-হাতে ভরতি করে তোলে, আঙুলের ফাঁক দিয়ে ঝুরঝুর করে ঝরে যায়। হাত দিয়ে সে থাপড়ায় সিমেন্ট, নয়, শুধু এলোমেলোভাবে ঘাটাঘাটি করে। জোয়ান বয়সে ছেলেবেলার ধুলোখেলার সুখ। কখনো খাবলা দিয়ে মুঠো করে ধরে, যতটা ধরতে চায় পারে না, অল্পই থাকে মুঠোর মধ্যে। হাসি ফোটে রঘুর ঠোঁটে। এখনো গঙ্গামাটির ভাগটা মেশাল পড়েনি-ও চোরামিটা কোম্পানি একটু গোপনে করে। কী চিকন মোলায়েম জিনিসটা, কেমন মিঠে মেঘলাবরণ। মুক্তার বুক দুটির মতো। বলতে হবে মুক্তাকে তামাশা করে, আবার যখন দেখা হবে।

এই শালা খচ্চর! গিরীনের গাল, ছিদামের নয়। ছিদাম বিড়ি টানছে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে, ব্যাটার তিনটে আব-বসানো কিম্ভুত মুখ দেখলে গা জ্বলে যায় রঘুর, গাল শুনলে আরো বেশি। রুমাল-পোছা আসছে বুঝি তার চাকে পাক দিতে, ব্যাটা হুলো বোলতা, গিরীন তাই সামলে দিয়েছে তাকে। চট করে কাজে মন লাগায় রঘু। গিরীনকে ভালো লাগে রঘুর, লোকটা হুলো বেড়ালের মতো রগচটা আর বেঁটেখাটো ষাড়ের মতো একগুঁয়ে হলেও যত বদমেজাজি হোক, যেকোনো হাসির কথায় হ্যাঁ হ্যাঁ করে হাসে যেন শেয়াল ডাকছে ফুর্তির চোটে। আবার কারো দুঃখ-দুর্দশার কথা শুনলে বাঘের মতো গুম হয়ে যায়, মাঝে মাঝে গলা-খাকারি দেয় যেন রোলার মেশিনে পাথর গুড়োচ্ছে মড়মড়িয়ে।

রুমাল-পোছা এল না দিকি?

না।

এল না এল, তোর কী রে বাপ্পোৎ ছিদাম বলে দাঁত খিঁচিয়ে, ওনার আর কাজ নেই, তোর কাজ দেখতে আসবেন? আমি আছি কী করতে?

কথা না কয়ে খেটে যায় রঘু। পোঁছাবাবু আসে এদিক-ওদিক তেরচা চোখে চাইতে চাইতে, দুবার রুমাল দিয়ে মুখ পুঁছে ফেলে দশ পা আসতে আসতেই। তার গালভরা নাম বিরামনারায়ণ-এই মুদ্রাদোষে চিরতরে তলিয়ে গিয়ে হয়েছে রুমাল-পোছা, সংক্ষেপে পোঁছাবাবু। গিরীন, গফু, ভগলু, নিতাই, শিউলালেরা একটু শক্ত বনে-গিয়েই কাজ করে যায়, ছিদাম যেন খানিকটা নেতিয়ে বেঁকিয়ে যায় পোষা কুকুরের ঢঙে, উৎসুক চোখে তাকায় বারবার মুখ তুলে, লেজ থাকলে বুঝি নেড়ে দিত।

তোর ওটা এখন হবে না গিরীন, সাফ কথা। হাঙ্গামা মিটলে দেখা যাবে।

দুমাস হয়ে গেল বাবু। হাঙ্গামার সাথে মোর ওটার—

বাস, বাস। এখন হবে না। সাফ কথা।

রুমালে মুখ পুঁছে এগিয়ে যায় পোঁছাবাবু। রগচটা গিরীন রাগের চোটে বিড়বিড় করে বুঝি গাল দিতে থাকে তাকে। ছিদাম একটু অবাক হয়ে ভাবে যে দুপুরের ভো পড়ার মোটে দেরি নেই, টহল দিতে বার হল কেন পোঁছাবাবু অসময়ে। ভোয়ের টাইম হয়ে এলে কাজে ঢিল পড়ে কেমন, ফাঁকি চলে কী রকম দেখতে? দেখবে কচু, পোঁছাবাবু টহলে বেরোলে টের পায় সবাই। এর বদলে তাকে ডেকে শুধোলেই সে বলে দিতে পারত সব।

খিদেয় ভেতরটা চো-চো করছে রঘুর, তেষ্টায় কি না তাও যেন ঠিক আন্দাজ করা যায় না, ঘেমে ঘেমে দেহটা লাগছে যেন কলে-মাড়া আখের ছিবড়ে। ভোর জন্য সে কান পেতে থাকে। আগে মুখ হাত ধোবে না সোজা গেটে চলে যাবে, বন্ধ গেটের শিকের ফাঁক দিয়ে চানা কিনবে না মুড়ি কিনবে, আগে পেট পুরে জল খাবে না দুমুঠো খেয়ে নেবে আগে, এইসব ভাবে রঘু। মুক্তাকে এনে রাখতে পারলে হত দেশ থেকে, রোজ পুঁটলি করে খাবার সাথে দিত বেন্দার বৌটার মতো। বৌ একটা বটে বেন্দার! রঙে ঢঙে ছেনালিতে গনগনে কী বাস রে মাগীটা, মুক্তার মতো কচি মিষ্টি নয় যদিও মোটে। তবে পুঁটলি করে বেন্দাকে খাবার দেয় সাথে রোজ, রুটি চচ্চড়ি ভাজা, নয়তো ঝাল-ঝাল শুখা ডাল, নয়তো চিচিঙার পেঁয়াজ হেঁচকি।

হঠাৎ বড় শ্রান্ত, অবসন্ন লাগে নিজেকে রঘুর। সে জানে এ রকম লাগলে কী ঘটবে এখুনি। কাশি আসছে। আঁতকানির মতো একটা টান লাগে ভেতরে, তারপর শুরু হয় কাশি; কাশতে কাশতে বেদম হয়ে পড়ে রঘু। হাঁটু গেড়ে সে বসে পড়ে, দুহাতে শক্ত করে নিজের হাঁটু জড়িয়ে হাঁটুতেই মুখ গুঁজে দেয়। এমনি করে আস্তে আস্তে শ্বাস টানবার চেষ্টা করলে কাশিটা নরম পড়ে, এক দলা সিমেন্ট-রঙা কফ উঠে আসবার পর কাশিটা থামে।

গিরীন গুম হয়ে তাকিয়ে থাকে বাঘের মতো, গলায় দুবার খাকারি দেয় আড়ালের রোলার মেশিনটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

আমি সাত বচ্ছর খাটছি, তুই শালা দু-চার বছরে খতম হয়ে যাবি!

ট্যাক ফ্যা-ফ্যা করছে রঘুর, পয়সা নেইকো। বেন্দার ট্র্যাকে দু-এক টাকা আছেই সব সময়, মাল টেনে এত পয়সা ওড়ায়, তবু। রঘু তাই দু-এক আনা ধার করতে যায় বেন্দার কাছে আর তাই সে দেখতে পায় রোলার মেশিনে কেষ্ট বাতাপির পিষে থেঁতলে যাবার রকমটা।

মাটিতে শিকড়-আঁটা গুমোটের গাছের মতো রঘু নড়েচড়ে না, মুখ হাঁ হয়ে যায়, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়। সরে পড়তে গিয়ে তাকে দ্যাখে বেন্দা, দাঁতে দাঁতে ঠেকে গিয়ে খিচে উঠে ছিরকুটে যায় বেন্দার মুখ। দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে সাপের হিশহিশানির আওয়াজে সে বলে, যা যা, ভাগ। পালা শিগগির।

দিশেহারা রঘু পালাতে গেলে কিন্তু ফের তাকে ডেকে বেন্দা বলে, শোন। এখানে এইছিলি খপরদার বলিসনি কাউকে, মারা পড়বিখপরদার।

পাতা হয়ে ঝড়ে উড়ে যেন রঘু ফিরে আসে নিজের জায়গায়, রঘুর প্রাণটা আর কি, নয়তো ফেরে সে পায়ে পায়ে হেঁটেই। মেঘলা গুমোটের কাল ঘাম ছুটেছে, সেটা দেখা যায়। ভাবসাব দেখে মনে হয়, কাশির ধমকটা ঝাঁকি দিয়ে গেছে তাকে, কাবু করে

দিয়েছে। কিন্তু রঘু ভাবে তার ভেতরের উলটেপালটে পাক-খাওয়াটা বুঝি চোখে পড়েছে সকলের, এই বুঝি কে শুধিয়ে বসে, ব্যাপারখানা কী রে!

জল খেলি? গিরীন শুধোয় বাপের মতো সুরে।

হ্যাঁ, খেলাম।

প্রথম ভোঁ বাজে দুপুরের। হাঁপ ফেলবার, ঢিল দেবার, জল-চানা খাবার এতটুকু অবকাশ। দমে আর হাতপায়ে একটু ঢিল পড়ে, মনটা শিথিল হবার সুযোগ পায় না কারো। হবু ধর্মঘট নিয়ে ব্যগ্র উত্তেজিত হয়ে আছে মজুরেরা, ও ছাড়া চিন্তা নেই, আলোচনা নেই। তার মধ্যে খবর ছড়ায় দুর্ঘটনার, কী তাড়াতাড়ি যে ছড়ায়। কেষ্ট বাতাপি রোলার মেশিনে পিষে থেঁতলে মারা গেছে খানিক আগে–এ খবর যে শোনে সে গুম হয়ে যায় খানিকক্ষণের জন্য, তারপর অকথ্য বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করে, এটা কী রকম হল? হু-হুঁ করে উত্তেজনা বেড়ে যায়, ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলাতে থাকে উত্তেজনার, সবার কথার মোট আওয়াজটা নতুন রকমের ধ্বনি হয়ে উঠে। প্রথম দিকে খবর পেয়ে কয়েকজন যারা ছুটে গিয়েছিল দেখতে, তারাই শুধু দেখতে পেয়েছে কেষ্ট বাতাপির হেঁচা দেহটা, জিজ্ঞেস করে ভাসা-ভাসা শুনতে পেয়েছে কিসে কী ঘটল। তারপর খেদিয়ে দেওয়া হয়েছে সকলকে, ওখানে। গণ্ডগোল করা বারণ হয়ে গেছে।

ছিদাম বলে, আহা রে! বিষবারের বারবেলায় পেরানটা গেল কপাল দোষে।

রগচটা গিরীন যেন চটেই ছিল আগে থেকে, শুনেই গর্জে ওঠে, বারবেলার কপালদোষ! পোঁছা বুঝি বলেছে তোকে বলে বেড়াতে? পোঁছার পা-চাটা শালা ঘাসি-বুড়ো! পোঁছা খুন করিয়েছে কেষ্টকে, জানিস? বজ্জাত শকুন তুই, চুপ করে থাক।

ছিদাম সরে পড়ে, চমক লেগে, চমৎকৃত হয়ে। কৌতূহলে ফেটে পড়ে তার মনটা। এদিক-ওদিক ঘোরে সে, ছাড়া ছাড়া কথা শুনতে ছোট ছোট দলের উত্তেজিত আলোচনার। কাছে যেতে তার ভরসা হয় না। সবাই হয়তো চুপ হয়ে যাবে, কেউ তাকাবে আড়চোখে, কেউ

কটমটিয়ে। যেটুকু সে শোনে তাতেই টের পায়, শুধু গিরীন নয়, অনেকেই বলাবলি করছে ষড়যন্ত্র-গোপন কারসাজির কথা।

আর একবার ভো বাজে। যে যার কাজে যায়। যন্ত্রের একটানা গম্ভীর গর্জনে চাপা পড়ে যায় বটে কথার গুঞ্জন কিন্তু খাটুনেদের কানাঘুষা চলতে থাকে কাজের মধ্যেই।

ছিদাম আমতা আমতা করে বলে, একটা কথার হদিস পাচ্ছি না, তোকে শুধাই গিরীন। কেষ্ট ভিন্ন ডিপাটে, রোলার মেশিনে ও গেছল কেন?

বদলি করল না ওকে ক-রোজ আগে? এই মতলব পোঁছা শালার, খুনে ব্যাটা!

হ্যাঁ-? বটে-?

কী তবে? গিরীন ফের চটে যায়, রগচটা গিরীন, কী বলতে চাস তুই? এক রোজ যে-কাজ করেনি সে-কাজে বদলি করবার মানেটা কী?

রঘু শোনে। তার খাপছাড়া ভয়ংকর অভিজ্ঞতা মানে পেয়ে পেয়ে বীভৎসতর হয়ে উঠেছিল আগে থেকেই, গিরীনের কথার মানে আরো পরিষ্কার হয়ে যায়।

ম্যানেজারের ডান হাত পোঁছাবাবু। কিছুদিন আগেও বড় খুশি ছিল পোঁছাবাবু তার ওপর। কত গোপন কথা পোঁছাবাবু জেনে নিত তার কাছে, ওপরের কত গোপন ব্যাপারের হদিস তাকে দিত, সেই সঙ্গে খোলা হাতে বোতল বোতল মদের দাম বকশিশ। সে রকম অনুগ্রহ পোঁছাবাবু আর তাকে করে না আজকাল, যদিও ছোটখাটো দয়া আজও তার জোটে, ছোটখাটো কাজে সে লাগে। দোষ তার নিজের। সবাই জেনে গেল তার ব্যাপার আর সাপের মতো বিছার মতো তাকে এড়িয়ে চলতে লাগল, ফলে আজ তার এই অবস্থা। তার নিজের গুখুরি ছাড়া আন্দাজ কি করতে পারত কেউ! আফসোসে বুকটা বিছার বিষে জ্বলে যায় ছিদামের। নিজের ঘরে সিঁধ দেওয়ার মতো কী বোকামিটাই সে করেছে। ম্যানেজার পর্যন্ত তাকে খাতির করে জানিয়ে জানিয়ে খাতিরের সাঙ্গাতদের কাছে নিজের

মান বাড়াবার কী ভূতটাই চেপেছিল তার ঘাড়ে। তা না হলে কি জানাজানি হয়, আর এমন ভাবে তার খাতির কমে যায় পোঁছাবাবুর কাছে। বড় বেশি মাল খাচ্ছিল সে কাঁচা টাকা পেয়ে পেয়ে, মাথার তার ঠিক-ঠিকানা ছিল না কিছু, বিগড়ে গিয়েছিল একদম। একটু যদি সে সামলে চলত, কর্তারা তাকে খাতির করে এটা চেপে গিয়ে যদি বলে বেড়াত ওপর থেকে তাকে পিষে মারছে, আজ কি তাহলে তার অগোচরে কেষ্ট বাতাপিকে রোলার মেশিনে পিষে মারবার ব্যবস্থা করতে পারত পোঁছাবাবু, কয়েকটা নোট তার পকেটে আসত না!

জ্বালা যেন সয় না ছিদামের। এত পাকা বুদ্ধি নিয়ে বোকামি করে সব হারাল, এখন যে একটা চাল চালবার বুদ্ধি গজাচ্ছে মাথায় সেটাকে দাবিয়ে রেখে ফের কি একটা সুযোগ হারাবে বোকার মতো? উসখুস করতে করতে এক সময় মরিয়া হয়ে সে বেন্দার কাছে যায়। ভয়ে এদিকে বুকটা কাপেও।

কী যে বোকার মতো কাজ করিস বেন্দা। চুপি চুপি বলে সে বেন্দাকে।

সরু সরু লাল শিরায় আচ্ছন্ন চোখে তাকিয়ে বেন্দা বলে, কী বলছ? বোকার মতো কী কাজ?

সবাই কী বলাবলি করছে জানিস?

কী বলাবলি করছে? চমকে আঁতকে ওঠে বেন্দা।

হুঁ, হুঁ, ছিদাম মুচকে হাসে প্রাণপণ চেষ্টায়, আরে বাবা, আমার কাছে চাল মারিস কেন? পোঁছাবাবু আমাকে জানে, আমি পোঁছাবাবুকে জানি। সবাই কী বলাবলি করছে জানা দরকার পোঁছাবাবুর।

বেন্দা ঢোক গিলে গিলে ভাবে। তারপর বলে, চলো, বলবে চলো পোঁছাবাবুকে।

পোঁছাবাবু বলে, কী রে ছিদাম, খবর আছে?

আজ্ঞে।

পৌঁছাবাবু তাকে বসতে বলে চেয়ারে। প্রায় রোমাঞ্চ হয় ছিদামের বুড়ো শরীরে। চাল খেটেছে তার। কাজে আর সে লাগে না, দরকার তার ফুরিয়ে গেছে, তবু এ ব্যাপারের কিছু সে টের পেয়েছে। ধরে নিয়ে একটু কি খাতির তাকে করবেন না পৌঁছাবাবু-ভেবেছিল সে। ঠিকই ভেবেছিল। নিজের পাকা বুদ্ধির তারিফ করে ছিদাম মনে মনে।

যেন আলাপ করছে এমনিভাবে পৌঁছাবাবু তাকে জেরা করে। সে টেরও পায় না। পৌঁছাবাবু কী করে জেনে নিচ্ছে যে সবাই ভোলাখুলিভাবে যা বলাবলি করছে তাও। সে ভালোরকম জানে না, পৌঁছাবাবু তার চেয়ে অনেক বেশি জেনে এর মধ্যেই ব্যবস্থা আরম্ভ করেছে প্রতিবিধানের।

গালে প্রকাণ্ড একটা চড় খেয়ে সে বুঝতে পারে চালাকি তার খাটেনি, আর একটা সে বোকামি করে ফেলেছে।

তবে সে আপনার লোক, যতই বোকা হোক। দুটো টাকা হাতে দিয়ে পৌঁছা বলে, কাজ করবি যা। বজ্জাতি করিস না। কংক্রিটের গাঁথনি উঠেছে, ওর মধ্যে পুঁতে ফেলব তোকে।

কাজে যখন ফিরে যায় ছিদাম, মাথাটা ভোঁতা হয়ে গেছে। মাথায় শুধু আছে যে আজ আস্ত একটা বোতল কিনে খাবে, দুটো টাকা তো দিয়েছে পৌঁছাবাবু। কিন্তু। প্রতিশোধ নেবে। এবার থেকে সে ওদের দলে।

শোন বলি গিরীন। কেষ্টকে ওরা মেরেছে টের পেয়েছি। আমি সাক্ষি দেব তোদের হয়ে।

তোর সাক্ষি চাই না।

.

অতি রহস্যময় দুর্ঘটনা, অতি সন্দেহজনক যোগাযোগ। মুখে মুখে আরো তথ্য ছড়িয়ে যায়, রহস্য আরো ঘনীভূত হয়ে আসে। গোবর্ধন নাকি সময়মতো এসেও কার্ড পায়নি ভেতরে ঢুকবার, সে তাহলে উপস্থিত থাকত দুর্ঘটনার সময়, যদি না কোনো ছুতায় সরিয়ে দেওয়া হত তাকে,-নাসিরকে যেমন ঠিক ওই সময় পোছা। ডেকে পাঠিয়েছিল সামান্য বিষয় নিয়ে বকাবকি করার জন্য। হানিফ ছুটির জন্য ঝুলোঝুলি করছিল আট-দশ থেকে, হঠাৎ কালকে তার ছুটি মঞ্জুর হয়েছে। পিষে থেঁতলে মরল কেষ্ট বাতাপি কিন্তু একজনও তার মরণ-চিৎকার শোনেনি, মেশিনের আওয়াজ নাকি চাপা দিতে পারে মরবার আগে মানুষের শেষ আর্তনাদকে! সোজাসুজি প্রমাণ কিছু নেই, কিন্তু সবাই জানে মনে মনে কেষ্ট দুর্ঘটনায় মরেনি, তাকে হত্যা করা হয়েছে। ম্যানেজারের, রুমাল-পোছার বুকে কাঁটা হয়ে বিধে ছিল কেষ্ট, বুঝতে কি বাকি থাকে কারো কেন তাকে মরতে হল, কী করে সে মরল।

রঘু টের পায়, ক্ষোভে আফসোসে অনেকে ফুঁসছে মনে মনে গিরীনের মতো যে, এমন একটা কিছু পাওয়া যাচ্ছে না যার জোরে পৌঁছার টুটি টিপে ম্যানেজারকে চেপে ধরে বাধ্য করা যায় পুরো নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি মানতে।

সে পারে। একমাত্র সে-ই শুধু পারে ওই অস্ত্রটি ওদের হাতে তুলে দিতে। কিন্তু বড় যে একটা খটকা আছে রঘুর মনে। কারসাজি কি ফাঁস হবে ওপরওয়ালাদের? আটঘাট বেঁধে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা কি করে রাখেনি ওরা-ধরি-মাছ-না। ছুঁই-পানির কায়দায়? কোনো যোগসাজশ কি প্রমাণ করতে পারবে কেউ? অস্ত্রটা শুধু পড়বে গিয়ে বেন্দার গর্দানে। আর কেউ যদি হত বেন্দা ছাড়া।

গাঁয়ের মানুষ, বন্ধু মানুষ। পয়সা ধার চাইলে কখনো না বলে না, ঘরে বোতল খুললে তাকে ডেকে দুপাত্র খাওয়ায়। রানী খুশি হয় তাকে দেখলে, এসো বোসো বলে ডেকে বসায় আদর করে, ঘরে রাধা এটা-ওটা খাওয়ায়, হাসি-তামাশা রঙ্গরসে মশগুল করে রাখে। মুক্তার জন্য বুকটা যে খা-খা করে তার, তাও যেন ভুলিয়ে দেয় রানী। ওর চলন-ফিরন নড়নচড়ন দেখে রক্ত তাজা হয়ে ওঠে তার, বুকের মধ্যে কেমন করে। আর কী

বুঝদার মেয়েটা, কত আপন ভাবে তাকে। কদিন আগে হঠাৎ খেপে গিয়ে সে যে বলা নেই কওয়া নেই জড়িয়ে ধরেছিল তাকে, সে রাগ করেনি, শুধু একটা ধমক দিয়েছিল। বেন্দাকে কিছু বলেনি, নিজে তফাত হয়ে থাকেনি, আগেরই মতো হাসিখুশি আপন ভাব বজায় রেখেছে।

কিন্তু বেন্দা শুধু খুন করেনি কেষ্ট বাতাপিকে পোছার টাকা খেয়ে, সে দালাল এই ছিদামের মতো। ব্ল্যাক তার ফাঁকা থাকে না কখনো, ঘরে-বাইরে সে বোতল বোতল মাল টানে, মিহি শাড়ি কিনে দেয় রানীকে, সব পাপের যা সেরা পাপ তারই টাকাতে। রঘুর মাথার মধ্যে বিছার হুলের মতো বিধে থাকে এই চিন্তা।

ছুটির পর ক্রুদ্ধ উত্তেজিত মানুষগুলো কেষ্ট বাতাপির দেহটা দাবি করে। ওকে যারা মেরেছে আজ তাদের মারা না যাক, শোভাযাত্রা করে কেষ্টকে তারা শ্মশানে নিয়ে যাবে। এদের মধ্যে নিজেকে কেমন একা আর অসহায় মনে হয় রঘুর। দুর্বল অবসন্ন লাগে শরীরটা, মুখটা এমন শুকনো যে ঢোক গেলা যায় না। মাথার মধ্যে রোলার মেশিনের ঘর্ঘর আওয়াজ চলে, জ্যান্ত একটা মানুষের খুলি চুরমার হয়ে যায় প্রচণ্ড শব্দে, তারপর সব যেন স্তব্ধ হয়ে যায় মানুষের নরম মাংস ঘেঁচে যাবার রক্তাক্ত শব্দহীনতায়।

বস্তিতে নিজের ঘরটিতেও সে একা। অন্য ঘরের বাসিন্দাদের হইচই বেড়েছে সন্ধ্যার সময়, রোজ যেমন বাড়ে। গলির ওপারে দুটো বাড়ির পরের বাড়ি থেকে শোনা যাচ্ছে ছিদামের গলা-ফাটানো বেসুরো গান, এর মধ্যে বুড়ো নেশা জমিয়েছে। একটানা কোদল চলছে সামনের বাড়ির তিন-চারটি স্ত্রীলোকের, ওদের মধ্যে কুজার বয়স গড়ন মুক্তার মতো, গলাটা কিন্তু ফাটা বাঁশির মতো-ভাঙা। সন্ধ্যার সময় বাড়ি যেতে বলে, বেন্দা কী দরকারে কোথায় গেছে। যাবে জেনেও রঘু মনে মনে নাড়াচাড়া করে, না গেলে কেমন হয়। রানী তাকে টানছে, এখন। থেকেই টানছে জোরালো টানে। এই যে তার একা একা মন খারাপ করে থাকা, রানী যেন ম্যাজিকে সব উড়িয়ে দেবে। তবু সে ভাবছে, না গেলে কেমন হয়। মনটা তার বিগড়ে গেছে বেন্দার ওপর, বিতৃষ্ণায় বিষিয়ে উঠেছে। সোজা সহজ একটা কথা বার বার মনে পড়েছে যে এসব লোকের সঙ্গে দহরম-মহরম রাখতে

নেই, হোক গাঁয়ের মানুষ, হোক বন্ধু মানুষ, চোর ডাকাত খুনের চেয়ে এরা বদ, ওদের সঙ্গে থাকলেই বিপদ। রানী যদি বেন্দার বউ না হত–

মালতীর ন বছরের মেয়ে পুষ্প এসে দুয়ারে দাঁড়িয়ে বুড়ির মতো বলে, কী গো, আজ রাধবে না?

বলে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করে থাকে জবাবের। অসুখ-বিসুখ যদি হয়ে থাকে, যদি আলসেমি ধরে থাকে না-রাধবার; যদি বলে, দুটি বেঁধে দিবি পুষ্প, সে ছুটে গিয়ে মাকে ডেকে আনবে। পুষ্পর আজ পেটটা ভালো করে ভরবে। উঠোনে পা ঝুলিয়ে ভিজে দাওয়ায় বসে বাতাসের সঙ্গে বকাবকি করছে পুষ্পর মা মালতী। থেকে থেকে চেঁচিয়ে উঠছে, ঠ্যাং ছিড়ো না, ঠ্যাং ছিড়ো না বলছি। ওবছর পুস্পর বাপ লক্ষ্মণের পা আটকে গিয়েছিল কলে, পাটা কেটে ফেলতে হয়েছিল পাছার নিচে থেকে, শেষ পর্যন্ত বাঁচেনি।

আলসেমি লাগছে পুষ্প।

মাকে ডাকি? বলেই পুষ্প ছুট দেয় রঘুর সায় শুনবার আগেই।

রানী আসে রঘুকে ডাকতে।

যাওয়ার যে চাড় দেখি না, হাপিত্যেশ করে বসে আছে লোকটা ঢেলে-ঢুলে।

চলো যাই।

গলিতে নেমে ছিদামের গান আরো স্পষ্ট শোনা যায়, কথাগুলো জড়ানো। নেশা আরো চড়িয়ে চলেছে ছিদাম। নয়তো মিনিট-কয়েক চেঁচানোর পর সে ঝিমিয়ে যায়, আশপাশের লোক স্বস্তি পেয়ে বলে, যাক, শ্যাল-শকুনের কোদল থামল।

গলি থেকে আরো সরু গলি, তার মধ্যে বেন্দার ঘর, কাছেই। লণ্ঠনের আলোয় ফুর্তির সরঞ্জাম সাজিয়ে বসে আছে বেন্দা। ভাড়ের বদলে আজ কাঁচের গেলাস, কিনেই এনেছে বুঝি। খুরিতে ঝাল মাংস, কাগজে ডাল বাদাম। জলের বদলে চারটে সোডা।

হুঁ হুঁ বাবা, আজ খাঁটি বিলিতি, দামি চিজ।

কফে গলাটা ধরা ছিল বেন্দার, রঘু ঘড়ঘড় আওয়াজ পায়। একদিনে যেন বেন্দার মুখটা আরো ছুঁচলো হয়ে চামড়া আরো বেশি কুঁচকিয়ে গেছে। মিহি শাড়িটা পরেছে রানী, তলায় বুঝি সালুর শেমিজ, রং বেরোচ্ছে। দানা দানা মিহি বুদবুদ উঠছে ভরতি গেলাসের টলটলে রঙিন পানীয় থেকে।

ঢেলে বসে আছি তোর জন্যে। মাইরি ঠেকাই নি ঠোঁট।

আজ তার বিশেষ খাতির। হবে না কেন, হওয়াই উচিত। গেলাস তুলে এক। চুমুকে শেষ করে ফেলে রঘু হঠাৎ যেন মরিয়া হয়ে, হঠাৎ খেপে গিয়ে সেদিন যেমন সাপটে ধরেছিল রানীকে।

আরে আরে, রয়ে-সয়ে খাও। রানী বলে খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে তার কাণ্ড দেখে।

বেন্দা বোতল থেকে তার গেলাসে মদ ঢেলে দেয়, খানিকটা সোডা দিয়ে খানিক জল মেশায়, সোডায় কুলোবে না।

নিজের গেলাসে চুমুক দিয়ে বলে, বাপস! ভাগ্যে তুই এলি আচমকা, অন্য কেউ নয়! প্রাণটা লাফিয়ে উঠেছিল কণ্ঠাতে মানুষ দেখে, তারপর দেখি তুই। ধড়ে প্রাণ এল। আরো দুবার চুমুক দেয়, খানিকটা বেপরোয়াভাবে বলে, তবে, কী আর হত! একটু হাঙ্গামা, বাস। পোঁছাবাবু ঝানু লোক, ঠিক করে নিত সব।

আর এক গেলাস ঢেলেছে সবে বেন্দা নিজের জন্য, লোক আসে পোঁছাবাবুর কাছ থেকে।

পোঁছাবাবু একবার ডেকেছে বেন্দাকে, এখুনি যেতে হবে, জরুরি দরকার। পোঁছাবাবু আছে ম্যানেজার সাহেবের কাছে, সেখানে যেতে হবে। ম্যানেজার সাহেব নিজের গাড়ি পাঠিয়েছে, বড় রাস্তার মোড়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে গাড়ি।

দুত্তেরি শালার নিকুচি করেছে। বেন্দা বলে বেজার হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে, তুই বোস রঘু, খা। চটপট আসছি কাজটা সেরে। গাড়ি করে যদি না দিয়ে যায় তো–

বেন্দা বেরিয়ে যেতে দরজা বন্ধ করে রানী। টুক করে এসে উবু হয়ে বসেই বেন্দার খালি গেলাসে বোতল থেকে মদ ঢেলে এক চুমুকে গিলে ফেলে জল বা সোডা না দিয়েই, ঝাঁজে মুখ বাঁকিয়ে থাকে কতক্ষণ।

রঘুর চাউনি দেখে বলে, কী হল, খাও? হাত বাড়িয়ে গালটা সে টিপে দেয় রঘুর।

ভালো করে বসে আর একটু ঢালে, এবার সোডা মিশিয়ে রসিয়ে রসিয়ে খায় একটু একটু করে। রঘু গেলাস তুলে ধরে তার মুখে।

কাছে ঘেঁষে এসে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে, ওকে বোলো না খেয়েছি। ফিরে এসে নেশা চড়লে নিজেই ডাকবে, তখন একটুখানি খাবখন দেখিয়ে। ফিরতে দেরি আছে, এক ঘণ্টা তো কম করে।

গায়ে লেগে কানে কানে কথা কয় রানী, তার মদ-পেঁয়াজের গন্ধ-ভরা নিশ্বাসে ঝড় ওঠে রঘুর মাথার রঙিন ধোঁয়ায়। গেলাস রেখে সে ধরে রানীকে।

রানী বলে, বাস রে, ধৈর্য নেই এতটুকু? গেলাসটা শেষ করো।

খালি গেলাস মদ সোডার বোতল তফাতে সরিয়ে জায়গা করে মুচকে হেসে নিজে থেকেই সে নেতিয়ে পড়ে রঘুর বুকে।

আর একটু ঢেলে খায়, রঘুকে দেয়। বলে, আর তোমার ভাবনাটা কী? কত বিলিতি খাবে তুমি এবার নিজের রোজগারে। তুমি চালাক-চতুর আছ ওর চেয়ে, ও তো একটা গোঁয়ার। এবার কত কাজে লাগাবে তোমায় পোঁছাবাবু, কত টাকা। কামাবে তুমি।

মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে রঘুর এতক্ষণ পরে।

যাই বাবা ওঘরে, কখন এসে পড়বে। যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে রানী আবার বলে, একটা কথা বলি শোনো। তোমার জন্যেও পোঁছাবাবু টাকা দিয়েছে ওকে, চেয়ে নিও। ভাগ ছাড়বে কেন নিজের? এমনি হয়তো চেপে যাবে, কথায় কথায় বোলো, মোকে কিছু দিলে না পোঁছাবাবু? তাহলে দেবে। চোখ ঠেরে রানী হাসে, বাৎলে দিলাম, ভাগ দিবে কিন্তু মোকে।

কানে তালা লেগে গেছে রঘুর, সেটা যেন মানুষের নরম মাংস পিষে তেলে যাবার যে শব্দ সেই-তার মতো। এই কাজ করতে হবে তাকে এবার, বেলা যা করে, ছিদাম যা করে। চুপ করে থাকলে তার চলবে না, পোঁছাবাবু তাকে কাছে টেনে কাজে লাগাবে বেন্দার মতো ছিদামের মতো। এই তার পথ। আর এক মুহূর্ত এখানে থাকলে তার যেন প্রাণটা যাবে এমনিভাবে চট করে খিল খুলে রঘু পথে নেমে যায়। হনহন করে এগিয়ে যায় অন্ধকার গলি ধরে। নেশা তার কেটে গেছে। মদের নেশার চেয়ে অন্য নেশাই তার হয়েছিল জোরালো। ছিদামের ঘরের কাছাকাছি সে হোঁচট খায় একটা মানুষের দেহে। নেশার ঝোকে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে ছিদাম রাস্তায় পড়ে আছে, কেউ তাকে তোলেনি। হোঁচট খাওয়ার রাগে একটা লাথি তুলে পা নামিয়ে নেয় রঘু। জোরে জোরে হাঁটতে শুরু করে। তার ধৈর্য ধরছিল না। কতক্ষণে গিরীনের কাছে গিয়ে বলবে নিজের চোখে যা কিছু দেখেছে-রোলার মেশিনের ঘটনা। সবাই যে অস্ত্রটি খুঁজছে, নিজের কাছে অকারণে একমুহূর্তের বেশি সেটি লুকিয়ে রাখবার কথা সে ভাবতেও পারছিল না।